অমর একুশে বইমেলার সাহিত্যিক মুখপত্র

সাতদিনের পত্রিকা

অর্ধ - সাপ্তাহিক

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৬ । শুক্রবার । ১৩ মার্চ ২০২৬ । ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

প্রকাশনা সংখ্যা

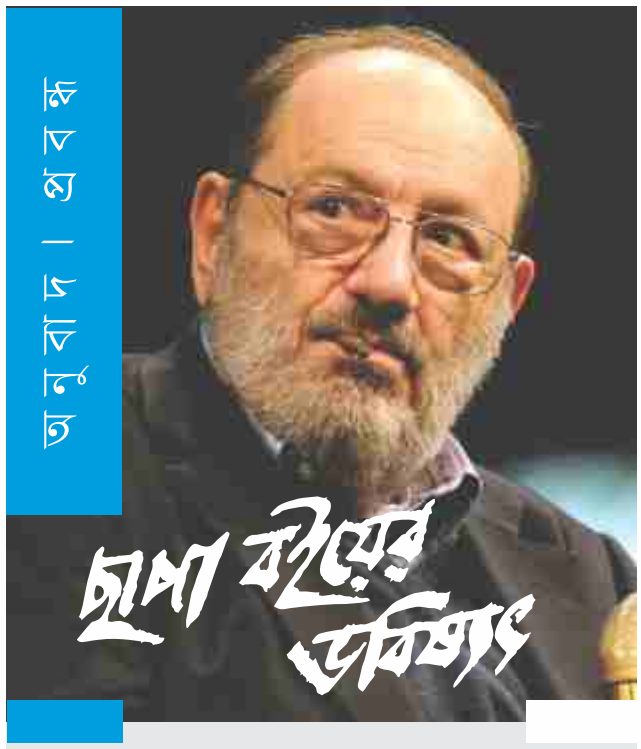

অনুবাদ । প্রবন্ধ

উমবের্তো একো

বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে থেকেই আশা করছিলাম কেউ না কেউ ‘সেসি তুয়েলা সেলা’ উক্তিটি উপস্থাপন করবেন। এ আলোচনায় উক্তিটি অপ্রাসঙ্গিক নয়। অনেকেরই ভিক্টর হুগোর *দ্য হাঞ্চব্যাক অব নটর ডেম* উপন্যাসের কথা মনে আছে হয়তো। উপন্যাসে ফ্রোলো নামের চরিত্রটি একটি বইয়ের সাথে তার পুরোনো ক্যাথেড্রালের তুলনা করতে গিয়ে ‘সেসি তুয়েলা সেলা’ (বই ধ্বংস করবে ক্যাথেড্রালকে, বর্ণমালা ধ্বংস করবে চিত্রকল্পকে) উক্তিটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে মার্শাল ম্যাকলুহান ম্যানহাটনের ডিসকোটেকের সাথে গুটেনবার্গ গ্যালাক্সির তুলনা করতে গিয়েও একই তুলনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে এ আলোচনায় আমাদের শঙ্কা একই। সেসি (কম্পিউটার) প্রযুক্তি কি আসলেই মুদ্রিত সেলাকে (বই) বিলুপ্ত করে ফেলবে?

এখন তো বই সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট জানি। কিন্তু কম্পিউটার বা প্রযুক্তি বলতে আসলে কী বোঝানো হয়? এটি কী এমন যন্ত্র, যার মাধ্যমে আমরা ক্রমেই চিত্রলিপি বা ‘আইকন’-এর দিকে ঝুঁকে পড়ব? এটি কী এমন যন্ত্র, যার মাধ্যমে কাগজ বা ছাপা হয় এমন কোনো অবলম্বন ছাড়াই লেখালেখি ও পড়া যাবে? নাকি এ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা ‘হাইপারটেক্সচুয়াল’ অভিজ্ঞতা অর্জন করব? এসব প্রশ্নের নিরিখে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে চিহ্নিত করা যথেষ্ট নয়। এখনও ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ মাধ্যম কম্পিউটারের চেয়ে শক্তিশালী। কম্পিউটার মূলত বর্ণমালানির্ভর যন্ত্র। স্ক্রিন জুড়ে যতই ছোট ছোট আইকন থাকুক, কম্পিউটার এখনও লেখালেখি ও পড়ার যন্ত্র। তাছাড়া কম্পিউটার এখন ছাপা এবং বিতরণের নতুন পথ তৈরি করেছে। আর

এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

একুশে বইমেলা ২০২৬

প্রকাশকের মুখোমুখি

এত বড় সাংস্কৃতিক আয়োজন থেকে দূরে থাকাটা কঠিন

—মাহরুখ মহিউদ্দিন, *ইউপিএল*

এবারের অমর একুশে বইমেলায় ইউপিএল শুরুতে অংশ নিতে চায়নি—এর পেছনে প্রধান কারণ কী?

মাহরুখ মহিউদ্দিন : সময়সূচি নিয়ে আমাদের কিছুটা আপত্তি ছিল। ঈদ, নির্বাচন আর রমজানের কারণে অনেক প্রকাশক ঈদের পরে মেলার আয়োজনের পক্ষে ছিলেন। আসলে মূল সংকট ছিল প্রস্তুতিতে। নতুন বই প্রকাশ, স্টলের নকশা ও বই পরিবহন, কর্মী নিয়োগ, নির্মাণ—এসব কাজের জন্য

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

সব জল্পনার অবসান হয়েছে, এটাই স্বস্তির

—আরিফুর রহমান নাইম, *ঐতিহ্য*

এবারের অমর একুশে বইমেলার আয়োজন নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা গিয়েছিল। মেলা আয়োজন ঘিরে এত জটিলতা হলো কেন?

আরিফুর রহমান নাইম : এটা নিয়ে তো আসলে বিস্তারিত কিছু বলার নেই। *ঐতিহ্য* একদম শুরু থেকেই বাপুসের পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমির সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে শুরুতে আমরা ভাবছিলাম, জানুয়ারির ৭ তারিখ থেকে

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

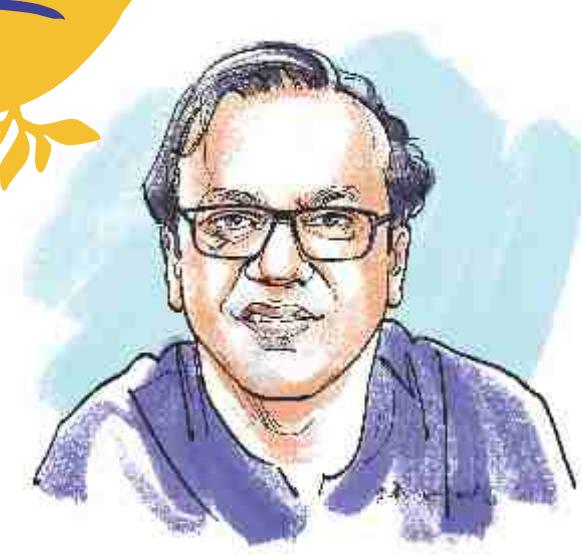

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটা বড়, কিন্তু সংগঠিত শক্তির অভাব

—প্রকৌ. মেহেদী হাসান, *বাংলাপ্রকাশ*

চলমান একুশে বইমেলা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

মেহেদী হাসান : একুশে বইমেলা আমাদের প্রকাশনাশিল্পের মূল প্রাণশক্তি। বছরের বেশিরভাগ বই এ মেলাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশকদের জন্য বড় আয়ের উৎস এবং পাঠকদের সাথে সরাসরি সংযোগের একটি সেতু হিসেবে বিবেচিত। এ বছর নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে বইমেলা হচ্ছে, এটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা। নানান জল্পনা-কল্পনা পেরিয়ে আমরা একসাথে সব প্রকাশক মিলে এ বছর একুশে বইমেলা উদযাপন করতে পারছি, এটা বিরাট আনন্দের।

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

মেলায় অংশ না নিলে লেখকদের শ্রমের পর্যাপ্ত মূল্যায়ন হতো না

—মাজহারুল ইসলাম, *অন্যপ্রকাশ*

মেলার আয়োজন নিয়ে এবার কিন্তু বেশ জল ঘোলা হলো। এখানে একটা বিভাজন ছিল। এমনটা কেন?

মাজহারুল ইসলাম : অমর একুশে বইমেলা আমাদের আবেগ এবং অস্তিত্বের অংশ। কিন্তু এবার ফেব্রুয়ারি মাসেই পবিত্র রমজান শুরু হয়েছে এবং মার্চে ঈদুল ফিতর। ২০ ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু করলে পাঠক যেমন রোজা রেখে মেলায় আসার স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, তেমনি ঈদের কেনাকাটার চাপে বইয়ের বাজার অনেকটা গৌণ হয়ে পড়বে। আমরা চেয়েছিলাম মেলাটা ঈদের পরে হোক, যাতে পাঠক শান্তিতে বই কিনতে পারেন এবং প্রকাশকরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

১ম পৃষ্ঠার পর

এত বড় সাংস্কৃতিক...

যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। অনেক প্রকাশকের অভিযোগ ছিল যে, স্টল বরাদ্দ ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দেরিতে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে মেলা শুরু হওয়ার আগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হয়েছে। ইউপিএল-এর মতো বড় প্রকাশনীগুলোর জন্য সমস্যাটা আরও জটিল। এমনিতেই আমাদের বইয়ের সংখ্যা বেশি আর স্টলও তুলনামূলকভাবে বড়। মেলার আয়োজনের সময় নিয়ে যে ধোঁয়াশা ছিল, সেজন্য প্রস্তুতির তেমন একটা সময় পাওয়া যায়নি। আবার মেলায় স্টল ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ নিয়ে অনেক আলাপ হলো। এত বড় একটি সাংস্কৃতিক আয়োজনের জন্য স্বচ্ছতা ও ন্যায়সংগত প্রক্রিয়া অনেক জরুরি। আমরা শুরু থেকেই সুসংগঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থাপনা চেয়েছি। এসব নিশ্চিত হলে অনাস্থা বা অসন্তোষের কিছু থাকে না।

১ম পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ নাগাদ মেলার আয়োজন করা যায় কি না। এ আলোচনার মাঝেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আমাদের প্রস্তাবিত এ সময়ে মেলা আয়োজন করা হলে তারা উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে পারবে না। এরপর আমরা বিকল্প চিন্তা করি। সেক্ষেত্রে ডিসেম্বরের ২০ তারিখ থেকে জানুয়ারির ১৭ তারিখ—এভাবে দুদিন বাড়তি সময় নিয়ে মেলা করব বলে ভাবি। কিন্তু প্রকাশকদের একটা অংশ এর বিরোধিতা করেন। এ অংশই আবার ফেব্রুয়ারির পরে মেলার আয়োজনের বিপক্ষে ছিলেন।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্তে আসা গেল কীভাবে?

আরিফুর রহমান নাইম : মেলার তারিখ নিয়ে তো আলোচনা চলছিল। এর মধ্যে বাংলা একাডেমিও আমাদের সঙ্গে বসেছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, এমনকি দায়িত্বশীল অনেকেই চাচ্ছিলেন মেলাটা যেন ফেব্রুয়ারিতে হয়। জানানো হলো, মেলার পূর্বপ্রস্তুতি বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা সরকার করে যাবে। নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসা সরকার মেলার আয়োজন আনুষ্ঠানিকভাবে করবে। তখনও কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ সময় প্রকাশকদের একটি অংশ মেলা এবার হবে না, মেলা হলেও ভালো হবে না—এসব প্রচার করতে থাকে। তখন বাংলা একাডেমি বাধ্য হয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সব ধোঁয়াশা দূর করার চেষ্টা করে।

সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টাও পরবর্তীতে জানান, ফেব্রুয়ারিতেই মেলা হবে। এবার আমাদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অপেক্ষা বাড়ে। অবশেষে ঘোষণা আসার পর আবার আলোচনার সুযোগ হয়। আলোচনার মাধ্যমে আমরা ২০ ফেব্রুয়ারি মেলা উদ্বোধনের প্রস্তাব দিই। কারণ রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীই সবসময় অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে যেহেতু তাকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হবে, সেহেতু ২০ তারিখে মেলার উদ্বোধন করাই বাস্তবসম্মত।

এরপর তো আরেকটা প্রচারণা শুরু হলো যে, ঈদের পর মেলা হবে। সেটাই বা কেন?

আরিফুর রহমান নাইম : মূলত ১০ জানুয়ারি থেকে একটি প্রচারণা শুরু হলো যে, ঈদের পর মেলা হবে, যা কখনোই বাস্তবসম্মত নয়। বাংলা একাডেমি দেখল, ঈদের পর মেলা করলে তা এপ্রিলে করতে হবে। এপ্রিলের সময়টি আমাদের এখানকার জন্য দুর্যোগপ্রবণ। কিন্তু এ সময় কিছু প্রকাশনী নানা অসুবিধার কথা বলছিল। তারা স্টল ভাড়া কমানো থেকে শুরু করে আরও অনেক যুক্তি দিয়েছে। রমজান মাসে মেলার আয়োজন নিয়েও অনেক তর্ক-বিতর্ক। অথচ রমজানে নানা কারণেই মানুষ শহরে ঘোরাঘুরি করেন। সে বিবেচনায় মেলায় পাঠক আসবেন না—এ ধারণাও ঠিক নয়। তবে শেষ পর্যন্ত মেলা হয়েছে, সব জল্পনার অবসান হয়েছে, এটাই স্বস্তির।

দেশের প্রকাশনীগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং তাদের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মনে হয় আপনার?

আরিফুর রহমান নাইম : চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলতে গেলে আসলে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করেই কথা বলতে হবে। যখনই কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থায় সংকট দেখা দেয়, তখন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড কিংবা সৃজনশীল অর্থনীতিগুলো কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে প্রকাশনীগুলোর কাজেও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে প্রকাশনীগুলোর বিক্রি কমেছে, এটা তো সত্য। কিন্তু সব প্রকাশনীই নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছে বা নিরলস চেষ্টা করছে। আমার ধারণা, আগামী ছয় মাস বা দেড় বছরের মধ্যে প্রকাশনীগুলো আবার শক্ত অবস্থানে ফিরে আসবে।

সব জল্পনার অবসান...

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা তো বড়। আপনারাও তো এ সংকটের বাইরে নন।

আরিফুর রহমান নাইম : তা তো অবশ্যই। তবে আমরা সচরাচর পরিকল্পনা করেই বই ছাপিয়ে থাকি। আর আমাদের নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীও আছে। তাদের প্রত্যাশাপূরণের প্রতিই আমাদের মনোযোগ থাকে। আমরা সব ধরনের অডিয়েন্সকেই গুরুত্ব দিতে চাই।

এছাড়া পাঠকের রুচি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রকাশকের একটি ভূমিকা রয়েছে। আমরা যদি সব সময় শুধু বাজারের চাহিদার দিকে তাকাই, তাহলে মানসম্পন্ন অনেক বই হয়তো প্রকাশই পাবে না। বই এমন একটি মাধ্যম, যেখানে গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে। তাই আমাদের কাজ হলো নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করা। প্রকাশনার ক্ষেত্রে লেখকের শ্রম ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হয়। এ কাজটা করা হয় মূলত রয়ালিটি দেওয়ার মাধ্যমে। লেখকই মূলত পুরো প্রকাশনা ব্যবস্থার কেন্দ্রে। তাই লেখকের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখকের সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ককে ঘিরে কিছু সংকট থাকে। এ প্রসঙ্গে কিছু বলেন।

মাহরুখ মহিউদ্দিন : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে এখন কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, বইয়ের কার্যকর বিপণনব্যবস্থা গড়ে তোলা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কপিরাইট সচেতনতা। লেখক ও প্রকাশকের অধিকার রক্ষা করার জন্য এই বিষয়ে আরও সচেতনতা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় লেখকদের রয়ালিটি নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হয়। আমার মনে হয় প্রকাশকদের উচিত এই বিষয়টিকে দায়িত্ব হিসেবে দেখা—এটি লেখকের ন্যায্য প্রাপ্য। আসলে আমাদের দেশে এখনও প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে এটিকে একটি শিল্পখাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে প্রকাশকদের জন্য নীতিগত সহায়তা পাওয়া সহজ হবে এবং পুরো খাতটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

শেষে বলুন এখানকার প্রকাশনাশিল্পকে কীভাবে দেখতে চান?

মাহরুখ মহিউদ্দিন : আমি চাই বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী হোক। আন্তর্জাতিক মানের বই প্রকাশ, উন্নত সম্পাদনা ও ডিজাইনের চর্চা এবং বিশ্ববাজারে পৌঁছানোর উদ্যোগ—এসব বিষয় আমাদের সামনে ভাবতে হবে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের বইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাঠক ছাড়া কোনো প্রকাশনাশিল্প টিকে থাকতে পারে না।

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটা...

প্রকাশনাশিল্পকে এখনও 'শিল্প' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কারণ কী?

মেহেদী হাসান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বড়, কিন্তু সংগঠিত শক্তির অভাব। ছোট-বড় মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে সাড়ে চার হাজারের মতো। এই বিশাল সংখ্যাই প্রমাণ করে, এটি একটি পরিপক্ব শিল্প-বাস্তবতা। কিন্তু নীতিমালায় স্বীকৃতি না পেলে, সরকারি কাঠামোর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত না হলে—সম্ভাবনা শুধু সম্ভাবনাই থেকে যায়। আমি আশাবাদী—সবাই মিলে সচেষ্ট হলে, সরকার যদি প্রণোদনার কাঠামো দাঁড় করায়, তাহলে একদিন বাংলাদেশের প্রকাশনা একটি স্বীকৃত ও গর্বিত শিল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। এই স্বীকৃতি প্রদান এখন সময়ের দাবি।

প্রকাশনাজগতে আপনার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। বর্তমানে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে কতটি বই প্রকাশিত হয়েছে?

মেহেদী হাসান : সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০০৭ সালের ১ এপ্রিল আমাদের যাত্রা শুরু। এই দীর্ঘ সময়ে পাঠকদের ভালোবাসা ও লেখকদের সহযোগিতায় আমরা এ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজারেরও বেশি বই প্রকাশ করেছি। প্রতিটি বইয়ের গুণগত মান এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বজায় রাখা আমাদের জন্য একটি বড় সাফল্য।

এই দীর্ঘ যাত্রায় প্রকাশনাজগতে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

মেহেদী হাসান : গত প্রায় দুই দশকে প্রকাশনাজগতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে মুদ্রণ এখন অনেক উন্নত এবং দ্রুততর। আগে যেখানে বিপণন ছিল শুধু লাইব্রেরি বা মেলাকেন্দ্রিক, এখন ই-কমার্স ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাঠক ঘরে বসেই বই সংগ্রহ করতে পারছেন। তবে এর পাশাপাশি কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং ডিজিটাল বিনোদনের আধিপত্যের কারণে পাঠাভ্যাস ধরে রাখাটা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশেও কি একটি আন্তর্জাতিক মানের বইমেলার আয়োজন সম্ভব?

মেহেদী হাসান : অবশ্যই সম্ভব। অমর একুশে বইমেলা আবেগ ও ঐতিহ্যের দিক থেকে অনন্য, তবে পেশাদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার' আয়োজনের সময় এসেছে। যেখানে বিশ্বের বড় বড় প্রকাশকরা অংশ নেবেন এবং কপিরাইট কেনাবেচার সুযোগ থাকবে।

একটি বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

মেহেদী হাসান : সবার আগে মানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এ ছাড়া দক্ষ জনবল তৈরি, পাইরেসি বা নকল বইয়ের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা এবং বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান বাজারে কাগজের উচ্চমূল্য সামলে বইয়ের দাম পাঠকদের নাগালে রাখাটাও একটি নিরন্তর সংগ্রাম।

তরুণ লেখকদের প্রতি বাংলাপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

মেহেদী হাসান : আমরা খ্যাতিমান লেখকের পাশাপাশি তরুণ লেখকদের বইও প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করছি—এটা আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত। আমার বিশ্বাস, তরুণদের তৈরি করতে না পারলে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। একটি জাতির সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ তার তরুণ লেখকদের কণ্ঠস্বরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

'বাংলাপ্রকাশ' নিয়ে ভবিষ্যতে আপনার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

মেহেদী হাসান : আমাদের লক্ষ্য *বাংলাপ্রকাশ*কে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। আমরা ডিজিটাল প্রকাশনা বা ই-বুক এবং অডিও বুক নিয়ে বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা করছি। এ ছাড়া আমাদের ক্ল্যাসিক কাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পৌঁছে দিতে একটি শক্তিশালী ট্রান্সলেশন উইং করার স্বপ্ন রয়েছে।

প্রবন্ধ

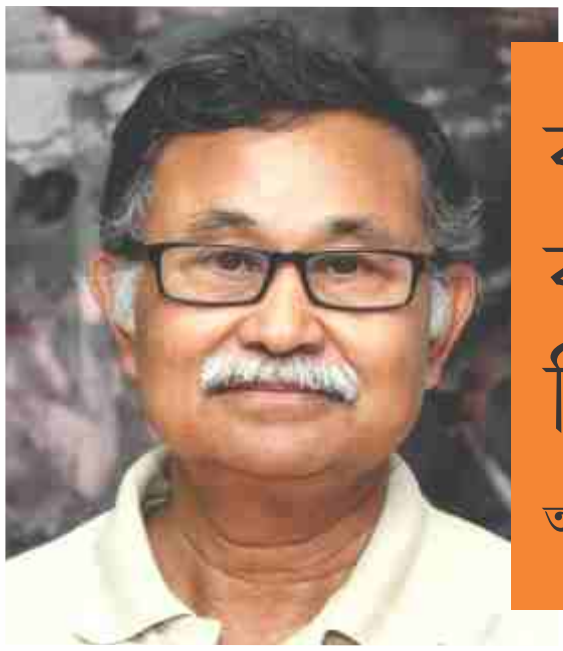

বাংলাদেশে বইয়ের বিজ্ঞাপন

আহমাদ মাযহার

সকলেরই জানা যে, বাংলাদেশে পাঠকের সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কম। এমন একটি দেশে বইয়ের বিজ্ঞাপন যে উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় হয়ে উঠবে না—এ কথা সহজেই অনুমানযোগ্য। পাঠকই যদি না থাকে, তবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লেখক বা প্রকাশক কার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন?

তবু বইয়ের বিজ্ঞাপন বলতে মূলত বোঝায় পাঠকের কাছে কোনো বইকে পরিচিত করে তোলা এবং তা কেনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। প্রকাশক, লেখক বা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান নানা মাধ্যমে বইয়ের প্রচারণা চালায়। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হলো—বইটির বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা, লক্ষ্য-পাঠকের কাছে পৌঁছানো, বিক্রয় বৃদ্ধি করা এবং অনেক ক্ষেত্রে লেখকের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলা। বইয়ের বিজ্ঞাপনের প্রথাগত মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সংবাদপত্র, সাহিত্য পত্রিকা কিংবা বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন। এ ছাড়াও পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার কিংবা বইমেলায় প্রচারণা—এসবও বাংলাদেশে বইয়ের বিজ্ঞাপনের পরিচিত মাধ্যম।

অন্তর্জালের উদ্ভবের পর বইয়ের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম—ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, এক্স, টিকটক—এসব প্ল্যাটফর্মে বইয়ের প্রচারণা এখন খুব সহজ। লেখকের নিজস্ব ওয়েবসাইট বা ব্লগ, অনলাইন বুকস্টোর কিংবা বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠীর মাধ্যমে বইয়ের খবর দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়। অনেক সময় ভিডিও আকারে তৈরি করা বুক ট্রেলারও বইয়ের বিজ্ঞাপনের নতুন এক মাধ্যম হয়ে ওঠে। পডকাস্ট বা অনলাইন আলোচনাতেও বইয়ের পরিচয় তুলে ধরা হয়।

উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে সাহিত্য ক্লাব, পাঠচক্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক পাঠ-আলোচনার একটি বিস্তৃত পরিসর আছে। বইয়ের প্রচারের ক্ষেত্রেও এসবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে আমরা প্রায় ভুলেই যাই যে, বইয়ের বিজ্ঞাপনের এটিও একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে রিভিউয়ার বা ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে বইয়ের প্রচারণার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।

কার্যকর বিজ্ঞাপনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে আকর্ষণীয় কাভার ডিজাইন। বইয়ের প্রচ্ছদ অনেক সময় পাঠকের সঙ্গে বইয়ের প্রথম পরিচয়ের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সেজন্যই প্রচ্ছদ নকশায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রাফিক ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় বইয়ের বিজ্ঞাপনে আগের সংস্করণের মূল্যায়নের উদ্ধৃতি বা খ্যাতিমান ব্যক্তির মন্তব্যও যুক্ত করা হয়। এসবই পাঠকের কাছে বইটির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। আবার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাণবন্ত ট্যাগলাইনও বইয়ের বিজ্ঞাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন, 'একটি বই, যা বদলে দিতে পারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি।' এই ধরনের বাক্য পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে।

আজ থেকে তিরিশ বা চল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত বইগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়—প্রচ্ছদ ও সামগ্রিক উপস্থাপনায় শিল্পরুচির পরিচর্যা থাকলেও ব্লার্ব, লেখক পরিচিতি বা ট্যাগলাইন নিয়ে খুব বেশি ভাবা হতো না। অনেক ক্ষেত্রে বইটির ধরন বা বিষয় বোঝার জন্য বইটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখা ছাড়া উপায় থাকত না। প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিপণনের প্রশ্ন যে গুরুত্বপূর্ণ—এই উপলব্ধি তখনও খুব শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আমাদের সমাজের একটি গভীর বৈশিষ্ট্য হলো—নিজেদের যাপিত জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে তেমন মূল্য না দেওয়া। সেই জ্ঞানকে ধারণ করে উত্তরপ্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার আগ্রহও তেমন দেখা যায় না। বাংলা বইয়ের ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা আরও স্পষ্ট হয়েছে। বইয়ের সংস্কৃতি নিয়ে যে অল্প কয়েকটি বই লেখা হয়েছে, তার অনেকগুলোতে বইয়ের বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থেকে গেছে। তবে সৌভাগ্যবশত সোমব্রত সরকার বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ লিখেছেন—*বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন : সেকাল থেকে একাল*। বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস নিয়ে এর চেয়ে বিস্তৃত আলোচনার কথা আমার জানা নেই। কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে বদিউদ্দিন নাজিরও *বইয়ের প্রচারণা বইয়ের বিজ্ঞাপন* (১৯৮৭) নামে একটি বই লিখেছিলেন এ বিষয়ে! বাংলাদেশে বই প্রকাশনার তখনকার বাস্তবতা যেমনটি ছিল তার পরিচয় বদিউদ্দিন নাজিরের বইটিতে আছে। রচনাকালের বাস্তবতায় বইটিতে যতটা তখন পর্যন্ত দীর্ঘকালের প্রচলিত রীতির পরিচয় আছে এখন তার হালনাগাদ করা দরকার। যদিও বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বইয়ের প্রচারণা বা বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য-পাঠকের কাছে পৌঁছার উপায় প্রায় নেই-ই!

সোমব্রত সরকারের মতে, বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত বইয়ের আখ্যাপত্রকেই বাংলা বইয়ের প্রথম বিজ্ঞাপন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বই প্রকাশের সঙ্গে বিপণনের প্রশ্ন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—এই পর্যবেক্ষণ থেকে বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়। বইয়ের বিপণনের প্রথম ধাপই হলো বিজ্ঞাপন।

বাংলা বইয়ের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস উনিশ শতকের শুরুতেই নতুন একটি ধারা তৈরি করে। ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। এটিকে বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র মুদ্রিত বই হিসেবে উল্লেখ করেন অনেকেই। সে সময় কলকাতার চিৎপুর, গরাণহাটা, শিয়ালদহ কিংবা শাখারিটোলায় একের পর এক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। বই ছাপা হচ্ছিল এবং সেগুলো বিক্রির জন্য ক্যানভাসাররা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বই ফেরি করতেন। এই ফেরিওয়ালারাই ছিল বইয়ের প্রথম প্রচারক।

১৮১৮ সালে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হলে বইয়ের বিজ্ঞাপনের একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। একই বছর ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায়ের সহমরণবিষয়ক একটি বইয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল—যা বাংলা ভাষায় বইয়ের বিজ্ঞাপনের একটি প্রাচীন উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বইয়ের বিজ্ঞাপন কেবল বিপণনের বিষয় নয়, এটি একটি সমাজের পাঠাভ্যাস, জ্ঞানচর্চা এবং সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তিরও সূচক। যে সমাজে বইয়ের বিজ্ঞাপন দুর্বল, সেখানে বইয়ের বাজারও সীমিত। আর যেখানে বইয়ের বাজার সীমিত, সেখানে চিন্তার জগতও ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসে।

লেখক : শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

পা ণ্ডু লি পি থে কে

নন্দনভাবনা ও বিবিধ বিবেচনা

ওবায়েদ আকাশ : *বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যের, অর্থাৎ কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের বিবর্তনটা আপনি কীভাবে দেখেন? সেই গত শতকের পঞ্চাশের বা ষাটের দশক থেকে এই একুশ শতকের প্রথম অবধি।*

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ফর্মটা পাল্টায়, প্রকাশভঙ্গিটা পাল্টায়। চিন্তাগুলো পাল্টায়। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা লেখক-কবিদের প্রভাবিত করে। কিন্তু মৌলিক বিষয় তেমন পাল্টায় না। আর একটা চিন্তা সব সময়ই থেকে যায়, সেটি হলো সৃষ্টিটা সৃষ্টি হচ্ছে কি না। যেমন গল্প গল্প হচ্ছে কি না, কবিতা কবিতা হচ্ছে কি না, উপন্যাস উপন্যাস হচ্ছে কি না। একটা সময়ে একটা গল্প যেভাবে দাঁড়িয়েছে, অন্য একটা সময়ে তা দাঁড়াতে না-ও পারে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, সাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে গতি মিলিয়ে যারা একটা গল্পকে গল্প করে তুলতে পারেন, একটি কবিতাকে কবিতা, তারা টিকে থাকেন। আমাদের দেশে এ রকম মেধাবী লেখক অনেকেই আছেন। আবার নতুন যুগে জন্ম নিয়ে শুধু তার যুগের প্রভাবটাকেই যিনি ফুটিয়ে তুলতে চান, তিনি মেধাবী হলে তা সহজেই পারেন। আমাদের তরুণদের মধ্যে এ রকম প্রতিভাবান লেখকরা আছেন।

ওবায়েদ আকাশ : *শাশ্বত স্বরের কথা বলছেন?*

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : না না, শাশ্বত বলে কিছু এই উত্তরাধুনিক যুগে ধোপে টেকে না। আমি বলছি কিছু সুর মৌলিকভাবে বেজে যায়।

ওবায়েদ আকাশ : *আমিও সেটাই বলছি, রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন নাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আছেন।*

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : নজরুল যেভাবে 'বিদ্রোহী' লিখেছেন, এখন তো আর কেউ সেভাবে আরেকটা 'বিদ্রোহী' লিখবেন না। নজরুলের 'বিদ্রোহী' আমার কাছে নির্বিকল্প। মৌলিক, তুমি যাকে শাশ্বত বলো তা-ই। আবার এখন যিনি তাঁর মতো করে আরেকটা 'বিদ্রোহী' লিখবেন, তিনি যদি মৌলিক একটি সুর বাজাতে পারেন, সেটিও দীর্ঘজীবন পাবে। পঞ্চাশ বছরের বিবর্তনে সেটি তাহলে হারিয়ে যাবে না। তবে কবিতার পাঠক এখন বদলেছে। মানুষ শিক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভেতর কিছু স্থূল চিন্তা ঢুকেছে। ফেসবুকের কথাই ধরো। মানুষের শোবার ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারতে মারতে সুকুমার বোধটাই আমরা হারিয়ে ফেলছি। যে মানবিকতার চর্চা হতো, একসময় তা কমে এসেছে। আর সাহিত্যের একটা মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষ এবং মানবিকতা। এই বিবর্তনে সেটা হারিয়ে যাচ্ছে কি না, তা আমাকে ভাবায়। প্রান্তিক মানুষ নিয়ে বলতে গিয়ে অনেক কৃত্রিমতাও এসেছে। শহরে বসে আমরা গ্রামের মানুষ নিয়ে লিখছি। গ্রামে যাচ্ছি না; কিন্তু প্রান্তিক মানুষ নিয়ে লিখছি। এতে লেখায় একটা ফাঁক থেকে যায়। ভাষার ক্ষেত্রে, দুই বাংলার কথাই বলছি, এই সময়ে অনেক দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছি। শক্তিশালী একটা ভাষা যেন তৈরি হচ্ছে না। আমাকে আবারও সেই সংস্কৃতনির্ভর, তৎসমনির্ভর ভাষায় যেতে হচ্ছে। এই সময়ের ভাষার একটা বলিষ্ঠ রূপ কোথায়?

ওবায়েদ আকাশ : *এই যে তৎসম-নির্ভরতার কথা বলছেন বা সাধু ভাষার ব্যবহার—এগুলোকে আপনি কীভাবে দেখছেন?*

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : নিরীক্ষার প্রবণতা সব সময় থাকবে, তাই বলে সকলেই এই কাজে নামলে তো মুশকিল। এ জন্য প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় সাধু ভাষায় লেখা হতে পারে। কারণ, যে ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে তার ঐতিহ্য ধরে রাখতে তা হতে পারে।

নন্দনচিন্তা ও বিবিধ আলাপ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

গ্রন্থনা : স্বকৃত নোমান, মোজাফ্ফর হোসেন

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
ধরন : সাক্ষাৎকার
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস

প্র ব ন্ধ

আমাদের প্রাচীন দুর্লভ প্রকাশনা কোথায় কী আছে

খান মাহবুব

প্রকাশনার আধেয়গত দিক সমাজ ও সভ্যতার শিরদাঁড়া। এ জন্য উন্নত বিশ্বের ব্রিটেন কিংবা ফ্রান্স তাবৎ বিশ্বের প্রকাশনাসমূহকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বিগত মানুষের যাপিত জীবন, ঘটনাপ্রবাহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক পরিক্রমণসহ বহুমাত্রিক বিষয় ধারণ করে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করেছে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গ জল-জঙ্গলময় স্থান ও প্লাবনভূমি ছিল, বিধায় এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সাবেকি আমলে তুলনামূলক কম স্থাপিত হয়েছে। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ এখানে বেশ পরে, ফলে প্রকাশনার বিস্তারও বিলম্বে ও মৃন্ময় গতিতে হয়েছে। এর চেয়ে মন্দ খবর হচ্ছে সাবেকি আমলের প্রকাশনা এবং তার তথ্য-উপাত্ত যতটুকু আছে, তা আমরা সংগ্রহ করে রাখিনি। ফলে এ বিষয়ে কাজ করতে গেলে কেবল খণ্ডিত তথ্য এবং অনুমান-অনুমিতির ওপর ভর করে এগোতে হয়।

আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, শতবর্ষীয় পাঠাগার, জমিদারদের সংগ্রহশালা, জেলা প্রশাসনের মহাফেজখানা, গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রাচীন প্রকাশনা ও প্রকাশনাজাত তথ্য-উপাত্তের কিছু সংগ্রহ আছে। তবে তার বেশিরভাগই অবিন্যস্ত ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের উপযোগী নয়।

আমাদের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থভান্ডার সংগ্রহ করেছে। প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে এসেছে ঢাকা কলেজ (১৮৪১) ও জগন্নাথ কলেজ (১৮৫৮)-এর গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালার একটি বিরাট অংশ। এছাড়া ঢাকা নবাব বাড়ি ও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এ সংগ্রহে ঋদ্ধ হয়েছে। পাল ও সেন আমলের বঙ্গে প্রাপ্ত তালপাতা, তেরেটপাতা, গাছের বাঁকল, সনাতনী কাগজের প্রায় ত্রিশ হাজার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে। সংস্কৃত, ফারসি, বাংলা, আরবি, দেবনাগরী, অহমীয়া ও বার্মিজ ভাষায় রচিত এসব পাণ্ডুলিপি আমাদের এ অঞ্চলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পদরেখা জানার আকরস্থান। ১৯৮৩ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘পাণ্ডুলিপি উন্নয়ন প্রকল্প’ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার রামমালা লাইব্রেরি, কিশোরগঞ্জের পাবলিক লাইব্রেরি, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রায় তিন হাজারের মতো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে মাইক্রোফ্লিম করে রাখা হয়। ১৯৮৮ সালে শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ থেকে ৫০টি পাণ্ডুলিপি, ২০০২ সালে কুমিল্লার বৌদ্ধবিহার এবং কক্সবাজারের রামু বৌদ্ধবিহার থেকে বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দুর্লভ মুদ্রিত বই ও পুথি এখনও ধূলিধূসর অবস্থায় আছে। ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. আহমদ শরীফের পরিবার থেকে ৪০৬টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ‘গুলিস্তাঁ’, ‘তৈলিয়ত নামা’, ‘শাহরুনের কেচ্ছা’ ইত্যাদি পুস্তিকা আমাদের অতীত পরিচয় জানতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ‘ঢাকা প্রকাশ’-এর মতো অনেক লুপ্ত পত্রিকার সন্ধান মেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। এছাড়া বিষ্ণুপুরান, পদ্মাপুরান, ইউসুফ জোলেখা, লায়লী মজনুর আদি সংস্করণ বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয়।

একটা দেশের প্রকাশনা সংগ্রহের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থাগার। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম ‘আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।’ শুরুতে ‘আরকাইভস’ শব্দ যুক্ত করে বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করা হলেও এখানকার সংগ্রহবিধি ও সংরক্ষণরীতি কাম্যমানের নয়। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দেশীয় প্রকাশনার সঙ্গে পরিচিত হতে যে বাৎসরিক গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা হয়, তাতে দেশের প্রকাশনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে না। আর সে প্রকাশনাও হালনাগাদ নয়। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মন্দ নয়। শুধু বই নয়, পুরোনো দিনের মানুষ বিক্রির দলিলসহ দুর্লভ সংগ্রহ সেখানে রয়েছে। বিভিন্ন রাজকীয় ফরমান, গণ-পরিষদের প্রসেডিং, আমাদের সংবিধানের মূল কপিসহ অসংখ্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বই, দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে। অনেক চিরায়ত বইয়ের প্রথম সংস্করণের কপি রয়েছে এখানে। কায়কোবাদের (আসল নাম, মোহাম্মদ কাজেম আল-কুরেশি) ‘মহাশ্মশান’ বইয়ের প্রথম সংস্করণ আমি জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখেছিলাম।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শুধু ইতিহাসের নানান স্মারকচিহ্ন সংগ্রহ করেই আমাদের সমৃদ্ধ করেনি, ঢাকা জাদুঘর থেকে জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় অনেক দুর্লভ বই সংগ্রহ করে।

তবু সংগ্রহের এ নাজুকদশা আমাদের প্রকাশনাকে যেমন পশ্চাৎপদ করেছে, একইসাথে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি অতীতের কথা জানতে। বইয়ের সংগ্রহ যে রত্নের ভান্ডার, তা অতীতকাল থেকেই মান্য। এজন্য প্রাচীনকালে কোনো জনপদ আক্রান্ত হলে পাঠাগারও আক্রান্ত হয়েছে একইসাথে। পাঠাগার আক্রান্ত হলে আঘাত লাগে জাতির মেরুদণ্ডে। এ কারণেই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের পাঠাগার আক্রান্ত না হলেও পাঠাগার ও বই সংগ্রহের প্রতি ঐতিহ্যগত অবহেলার ফল ভোগ করছি আমরা। কোনো গবেষণাকর্মে আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় প্রতিবেশি দেশের পাঠাগার, ব্রিটিশ পাঠাগারসহ অন্যান্য দেশের ওপর। প্রকাশনার দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেবল গুরুত্বের নয়, বোধেরও বটে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশনা-শিল্পে...

করছে। আমি তো প্রথমে পাঠক, তাই এত কিছু আর যাচাই-বাছাই করতে যাই না। কিন্তু বই নিয়েই যেহেতু কাজ, সেহেতু এগুলো একটু জেনে নিতেই হয়।

বই পড়ার অভ্যাস সেই শৈশব থেকেই। পড়তে পড়তে একসময় প্রতিদিনের একটা বড় অংশ এ বইয়ের সঙ্গেই কীভাবে কীভাবে যেন জড়িয়ে গেল। তবে বিষয়টিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছুটা পেশাদার ভঙ্গিতে উপস্থাপনের শুরু ২০১৯ সাল থেকে। বই ব্যবহার করে তখন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সিংয়ের কাজটি চালিয়ে গিয়েছি। ওই সময় বইয়ের ছাপার দিকে সবসময়ই মনোযোগ রাখতে হয়েছে। কিন্তু ছাপার যে পুরো প্রক্রিয়া, অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সম্পাদনা, প্রুফরিডিং, প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে মেকাপ ও বইটির বিপণনের প্রক্রিয়ার সবটুকু জানার সুযোগ হয়েছিল প্রকাশনীগুলোর সঙ্গে যখন পেশাদার জায়গা থেকে কাজ শুরু করি।

কোনো বইয়ের মুদ্রণ যখন ভালো হয়, তখন সেটা পাঠকের মনস্তত্ত্বে অবচেতনেই প্রভাব ফেলে। কোনো বইয়ের প্রচ্ছদ দেখেই হয়তো কেউ বইটি কিনবেন না, কিন্তু প্রচ্ছদ দেখে বইটির কন্টেন্টের বিষয়ে মানসিক ধারণা অন্তত নেবেন। তারপর ফ্ল্যাপের সারাংশ দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। আর যখন সামগ্রিকভাবে বইয়ের প্রোডাকশনটি ভালো লাগবে, তখনই পাঠকের মনে বইটি পড়ার আগ্রহ জাগবে। শুরুতেই যদি বইয়ের মান পাঠকের অবচেতন মনে একটুও বিরক্তি আনে আর পাঠের অভিজ্ঞতাকে সুন্দর করতে না পারে, তাহলে ভালো কন্টেন্ট হলেও পাঠক তা আর নিতে চান না। ব্যতিক্রম যে নেই, তা তো নয়। তবে বড় একটা অংশের ক্ষেত্রে এটিই সত্য।

সেজন্য আমরা যারা বুক ইনফ্লুয়েন্সার, তাদের আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে এ প্রোডাকশনের বর্ণনা। কারণ প্রকাশনীগুলো যে এখন ছাপার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ক্রিয়েটিভ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। এখন ইন্টারনেটের যুগে অনেকেই অনলাইনে কন্টেন্ট পড়েন। কিন্তু ছাপা বইয়ের পাঠক যে একেবারে নেই তা নয়। সংখ্যাটি যে অনুপাতে বাড়ার প্রয়োজন ছিল, তা বাড়েনি। কিন্তু প্রকাশনীগুলো এখন যেহেতু টার্গেট রিডার ভেবেই বই ছাপাচ্ছে, তাই সেগুলোকে ভালোভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপনও ভীষণ জরুরি। আমি ইনফ্লুয়েন্সের জায়গা থেকে বলতে পারি, এই যে এত এত প্রকাশনী দারুণ দারুণ আর দুর্দান্ত সব ভালো কাজ করছে, তা সত্যিই মুগ্ধ করার মতো।

লেখক : ইনফ্লুয়েন্সার, ‘বুকস অ্যান্ড মোর উইথ অথৈ’

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শি ত ক য়ে ক টি ব ই

নন্দনচিন্তা ও বিবিধ আলাপ
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
গ্রন্থনা : স্বকৃত নোমান, মোজাফ্ফর হোসেন
মূল্য : ৩৯৪৳

সাপ ও শাপলা
নিকোস কাজানজাকিস
ভাষান্তর : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস
মূল্য : ৩৯৪৳

ডিজারশন
আবদুলরাজাক গুরনাহ
ভাষান্তর : আলী আহমদ
মূল্য : ৬৬০৳

কেবল চেয়েছি পেতে পাতার মহিমা
তপন বাগচী
মূল্য : ৩৫০৳

পুষ্প ও ছুরিকা
হাসান হাফিজ
মূল্য : ৩৫০৳

শতবর্ষের সেরা বাংলা গান
আসলাম আহসান
মূল্য : ৯০০৳

বাঙালির ইতিহাসের পুনর্পাঠ
ড. রতন সিদ্দিকী
মূল্য : ৩২০৳

New Normal and Other poems
Pias Majid
Translated by Alamgir Mohammad
মূল্য : ৩৮০৳

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd

স্টল নম্বর : ৬১৭—৬২১

শেষ পৃষ্ঠার পর

লেখক প্রকাশনার প্রাণ...

যে পরিমাণ ভিড় আমরা সচরাচর দেখে থাকি, সে পরিমাণ পাঠক সবসময় থাকে না। জনসমাগম বিবেচনায় এবার মানুষ কম, কিন্তু পাঠক বা বইয়ের প্রকৃত ক্রেতা হিসেবে এ বছর বইমেলা হতাশ করেছে বলা যাবে না। হয়তো পূর্বের তুলনায় বিক্রি কম হয়েছে, কিন্তু বইমেলা কেবল বই বিক্রির জায়গা তো নয়, এটা লেখক-প্রকাশক-পাঠকের মিলনমেলাও।

বই প্রধানত একটি পণ্য। কিন্তু আমাদের একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে বইকে আলাদা একটা চেতনার, খানিকটা স্পিরিচুয়াল এনটিটি হিসেবে বিবেচনা করা। আমি যখন একে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করব, তখন সেটার মান উন্নয়নের জন্য আমার অর্থ ব্যয় করতে হবে, সময় ব্যয় করতে হবে। এর প্রোডাকশন, ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যান্ডিং, প্রোমোশন—সবকিছুই দেখতে হবে। নইলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মর্যাদা লাভ করবে না। ন্যূনতম ব্যবসাও হবে না।

একটা মানসম্পন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে হলে এমন পথ বা পদ্ধতি শুরু করা প্রয়োজন, যা বইকে বিপণনযোগ্য পণ্যে বিকশিত করবে। বই ছেপে শেলফে স্তূপ করে বা বইমেলায় স্টলের সামনে বিছিয়ে রাখার নয়—বই প্রদর্শনের বিষয়। একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে প্রতিটি বইয়ের। এই বইকে উল্টিয়ে দেখতে হবে। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বর্ণ বইটির অস্তিত্ব জানান দেবে। প্রকাশককে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। এই সচেতনতা না থাকলে লেখক লিখবেন, প্রকাশক ছাপবেন, বই পড়ে থাকবে তার জায়গায়, পাঠককে টানবে না।

বাংলাদেশে বই পড়ার সংস্কৃতি ভালো নয়। পাঠ-সংস্কৃতিটা গড়ে ওঠার পেছনে বিদ্বৎসমাজ, যেটাকে আমরা মননশীল, সৃজনশীল নানানভাবে ভাগ করি, সেখানে একটা সংকট রয়েই গেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে সৃজনশীল এবং মননশীল সাহিত্যপাঠের প্রবণতা বা ঝোঁক তৈরির ব্যবস্থা নেই।

বইয়ের এখনকার মূল চ্যালেঞ্জ হলো পাঠকের সাথে যোগাযোগ তৈরি করা। মানুষের রুচি ও মননশীল যে ঝোঁক, সে ঝোঁকের প্রতি যদি মনোযোগী হওয়া যায়, তাহলে বেছে নেওয়া যায় সহজেই এই সময়ের জন্য কোন বইয়ের প্রয়োজন। পদ্ধতিগতভাবে কিছু পন্থা বেছে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে সারাবছর পাঠকের সাথে একটা যোগাযোগের সেতু রক্ষা পায়। লেখকরা প্রকাশনার প্রাণ কিন্তু পাঠক হলো তার আয়ু। প্রাণশক্তিই যদি গড়ে না ওঠে, প্রকাশনার আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

এ ডিজিটাল বাস্তবতার যুগে কেবল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজ হবে না। বইয়ের প্রচারণাও সচল ও জীবন্ত হতে হবে। মানুষ এখন স্টিল ইমেজে তৃপ্ত নয়। জীবন্ত সচল ইমেজে ঢুকে যেতে চায়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের চলিষ্ণু বিষয়কে যদি হাতছাড়া করে ফেলি, আবার সেই স্টিল ইমেজের ভেতরে, বিজ্ঞাপনের সেই সনাতনী ধারায় ঢুকে যাই, তবে প্রকাশনাশিল্পও কিন্তু বিকশিত হতে পারবে না। অনেক ভালো ভালো বই হচ্ছে, কিন্তু পাঠকের সাথে তার যোগাযোগ তৈরি করা যাচ্ছে না। সে ব্যর্থতা কিন্তু প্রকাশকেরও।

এই সময়ের একটা প্রবণতা—মোড়ক উন্মোচন। মোড়ক উন্মোচনের বেঢপ প্রক্রিয়ায় বইটাই আসলে চাপা পড়ে। একটা আড়ম্বরপূর্ণ আকর্ষণীয় আয়োজন—জানি না এটা প্রকাশকরা কেন করেন। মোড়ক উন্মোচন আসলে লেখকের বই থেকে পাঠককে উল্টো দূরেই ঠেলে দেয়। হওয়া চাই প্রকাশনা উৎসব। বুক টক। প্রাণবন্ত বই আলোচনা। প্রতিটা বইকে ফোকাস-লাইনে আনা চাই। আবার, পরীক্ষার আগের দিন পড়তে বসার মতো বইমেলার আগমুহূর্তে বই ছেপে আসলে বইয়েরই দ্রুত মৃত্যু ঘটে।

এ বছর বেঙ্গলবুকস ও কিন্ডারবুকস প্রকাশনা পরিবার হতে নিয়মিত বের হওয়া *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকা* চতুর্থ বছরে পা দিল। পত্রিকাটির সমৃদ্ধি ও পাঠকপ্রীতির দারুণ সাফল্যে আমরা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ নানা ঝুটঝামেলার পর শেষমেশ হচ্ছে। পক্ষ-বিপক্ষের সারবত্তা হলো সবাই বাংলাদেশের প্রকাশক। সবাই মিলে একটা সুন্দর বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঠক আসছে। সামনে ঈদ, ঈদের শপিংয়ে যারা বের হচ্ছেন, তারা নিশ্চয়ই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একবার হলেও ঢুঁ মেরে যাবেন। সে আশাটা আমরা রাখতেই পারি।

বইমেলা জমে গেছে। বৈরী সময়ে যেটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি। সবাই আসুক, এই ঈদের কেনাকাটার সঙ্গে বইও কিনুক। পাঠককে আগাম ঈদের শুভেচ্ছা।

১ম পৃষ্ঠার পর

মেলায় অংশ না নিলে...

এখন অনেকে বলেছেন যে, একুশে ফেব্রুয়ারির একটা ঐতিহ্য আছে সেটা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আমরাও ঐতিহ্যকে সম্মান করি। কিন্তু বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। পাঠক যদি আসতেই না পারেন, তবে সেই আয়োজনের সার্থকতা কোথায়? আমরা চেয়েছি মেলা যেন উৎসবমুখর হয়, চাপের মুখে যেন দায়সারা কিছু না হয়। আমরা এ জন্য 'প্রকাশক ঐক্য' নামে একটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হই।

সাংগঠনিক জায়গা থেকেই আসলে আমরা ঈদের পর আয়োজনের পক্ষে ছিলাম। এ ক্ষেত্রে কিছু যুক্তি ছিল। রমজানের সময় মেলা অনেকাংশে ব্যবসায়িক আত্মহত্যা। প্রকাশনায় অধিকাংশ প্রকাশনীর যে বিনিয়োগ, তার তুলনায় রিটার্ন কম। আবার মেলায় স্টল পরিচালনারও কিছু সমস্যা ছিল। স্টলগুলোতে অধিকাংশ সময় বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা কাজ করেন। রোজা রেখে মেলায় কাজ করা কঠিন।

শেষপর্যন্ত কী কী বিষয় বিবেচনা করে মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন?

মাজহারুল ইসলাম : মেলা ফেব্রুয়ারির এ সময়টায় আয়োজনের সমস্যা ও বাস্তবসম্মত চ্যালেঞ্জগুলো আমরা উপস্থাপন করেছি। এরপর যখন এ নিয়ে সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমরা কয়েকটা কারণে অংশ নিয়েছি। প্রধানত লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা। আমরা এ মেলায় অংশ না নিলে লেখকদের শ্রমের পর্যাপ্ত মূল্যায়ন হতো না। তা ছাড়া প্রকাশনাশিল্পের জন্য বইমেলা বড় আয়েরও উৎস। আমরা যদি একা মেলাটা বর্জন করতাম, তাহলে সামগ্রিকভাবে এ শিল্পে বিভাজন তৈরি হতো।

এখানে অনেক জায়গায় দায়বদ্ধতা আছে। সবগুলোকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। মেলায় অংশ সেজন্যই নেওয়া। কিছু চ্যালেঞ্জ তো আছেই। বই প্রকাশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এসেছে। তাও আমরা সেগুলো কাটানোর চেষ্টা করেছি। আমরা চেষ্টা করছি বইয়ের দাম যতটা সম্ভব সহনীয় রাখতে, যাতে পাঠকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। কিন্তু মুদ্রণ-সামগ্রীর দামের যে ঊর্ধ্বগতি, তাতে আমাদের পক্ষেও খুব বেশি ছাড় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

ইন্টারনেট আর ই-বুকের এ যুগে অন্যপ্রকাশের অবস্থানটিকে কীভাবে দেখেন?

মাজহারুল ইসলাম : প্রযুক্তির বিকাশ অনেক হয়েছে। কিন্তু ছাপা বইয়ের আবেদন কখনোই ফুরাবে না, এ বিষয়ে আমাদের বরাবরই আস্থা ছিল। *অন্যপ্রকাশ* পাঠকদের আস্থা অর্জন করায় এখন প্রকাশনা জগতেই একটা ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। এখানে কি প্রযুক্তির ব্যবহার নেই? আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে শিখেছি। আমাদের ছাপা, বই সম্পাদনা থেকে শুরু করে সবকিছুতেই প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক। কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আধুনিক প্রিন্টিং টেকনোলজি—সবকিছুরই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রযুক্তির তো বিকাশ হবেই। সেটাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। শেষ পর্যন্ত এটা আমাদের কাছে একটা ব্যবসা। আবার এও সত্য, প্রকাশনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও হয়। এ জন্য প্রকাশকদের স্মার্ট হতে হবে। প্রযুক্তিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে। এখন তো আর শুধু বই ছাপালে হয় না। ডিজিটাল মাধ্যমেও সেটার বিপণন করতে হয়। এসব ভেবে এখন আমরা আন্তর্জাতিক বাজারের দিকেও মনযোগ বাড়িয়েছি। গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কাজ করছি। আসলে বইকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে।

এখনও তো প্রকাশনীগুলোর কিছু সংকট আছে। সেগুলো কি প্রভাব ফেলছে না?

মাজহারুল ইসলাম : তা তো থাকবেই। প্রকাশনা এমন এক ধরনের বাণিজ্য, যেখানে সংকট থাকবেই। এটা এমন এক ব্যবসা, যেখানে বইকে ভালোবেসে আসতে হয়। লাভের চিন্তাটা বেশি বেশি করলে হবে না। প্রকাশনীগুলোর এখন মূল সংকট, বই প্রকাশের কাঁচামালের দাম অনেক বেড়ে গেছে। কাগজের দাম কয়েক গুণ বেড়েছে। আবার এখানে বই নিয়ে আয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে ভালো সংগঠকের অভাবও আছে। যেকোনো বইয়ের সম্মিলনীর ক্ষেত্রে আয়োজনের পরিসরটা ভালো হতে হয়। এসব অনেক সংকট আছে। তবে আমি বিশ্বাস করি, সকল সংকট অতিক্রম করেই বাংলাদেশে প্রকাশনাশিল্প এগিয়ে যাবে।

১ম পৃষ্ঠার পর

হাইপারটেক্সটের ধারণাটি যে ইতিহাসে আগেও ছিল তা জেমস জয়েসের *ফিনেগানস ওয়েক* পড়লেই দেখা যায়।

তবে কোনো নতুন ধারণা যে অন্য ধারণাকে শেষ করে দেবে—এ চিন্তা অনেক পুরোনো। প্লেটোর ফিড্রাস সংলাপে লিখনপদ্ধতির উদ্ভাবক দ্যুথের প্রসঙ্গ আসে। সেখানে ফারাও থামাসের কাছে তিনি উদ্ভাবিত এ পদ্ধতির প্রশংসা করে বলেছিলেন, তার এ কৌশল মানুষের স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করবে। তবে ফারাও তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার মতে, এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে মানুষ আর নিজের স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করতে চাইবে না। বরং বাহ্যিক কিছু চিহ্নের মাধ্যমে মানুষ কিছু মনে রাখার চেষ্টা করবে। ফারাওয়ের দুশ্চিন্তা যে অমূলক নয়, তা আমরা বুঝতে পারি।

এখন অবশ্য কেউ আর প্রতিস্থাপনকে এভাবে ভয় পায় না। বই এমন একটি উপকরণ, যা মানুষের হয়ে চিন্তা করে দেয় না, বরং নতুন চিন্তার উদ্রেক করে। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ায় মানুষ স্মৃতি

ছাপা বইয়ের...

অবলম্বনে অনেক জটিল কাজ করতে পেরেছে। তাই বই স্মৃতিশক্তিকে স্থবির করে দেয় না, বরং একে আরও শাণিত করে।

বর্তমান যুগকে প্রায়ই ছবির যুগ বলা হয়। কিন্তু কম্পিউটার আমাদের আবারও অক্ষর বা লিখনপদ্ধতির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কম্পিউটার স্ক্রিন মূলত অক্ষরের একটি জগত। আজকের তরুণ প্রজন্ম ছবির চেয়ে স্ক্রিনে টেক্সট পড়তে এবং টাইপ করতে বেশি পারদর্শী।

প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার কি বইকে সেকেলে করে দেবে? বা ছাপা কাগজকে? আমি তা মনে করি না। উল্টো কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপা বই আরও বেশি উৎসাহিত হচ্ছে। বইয়ের কিছু অনন্য সুবিধা আছে। বই হলো তথ্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে সস্তা, নমনীয় এবং সহজলভ্য উপায়। বিদ্যুৎ ছাড়াও এটি পড়া যায়। আঘাতেও সহজে নষ্ট হয় না। একটি বইকে আপনি ভাঁজ করে পকেটে রাখতে পারেন, যা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে নতুন প্রযুক্তি আসায় এনসাইক্লোপিডিয়া বা নির্দেশিকার মতো বিশেষ কিছু গ্রন্থ সেকেলে হয়ে যাবে। এখন সিডি রমেই অনেক বড় এনসাইক্লোপিডিয়া রাখা যায়। কোনো তথ্য দ্রুত খুঁজে নেওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্য বা দর্শনের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্যই পর্যাপ্ত নয়। এখানে ধীরেসুস্থে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ছাপা বইয়ের বিকল্প নেই। কম্পিউটার স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা আর বই পড়া এক নয়। অনেকক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার পর চোখের আরাম লাগে। এজন্যই একটা ভালো কবিতা বা গল্পের বই পড়তে চায় মানুষ। একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে চায়। ইন্টারনেটের কারণে এখন অনেকেই প্রকাশনা সংস্থার মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে।

নতুন প্রযুক্তি এলে পুরোনোটা মরে যায় না, বরং বদলে যায়। ফটোগ্রাফি যেমন চিত্রকরদের হুবহু অনুকরণের কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছিল, তেমনি সিনেমা বা কমিকস সাহিত্যকে বর্ণনামূলক কাজ থেকে মুক্ত করেছে। আজকের আসল সমস্যা কম্পিউটার বনাম বই নয়; বরং ইন্টারনেটের যুগে একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা। তবে আমি আশাবাদী। উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে একটি অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষ ফ্যাক্স প্রযুক্তির ব্যবহার করে ঐক্যবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত তারা রাস্তায় নেমে জয়ীও হয়েছিল। এটি আসলে রূপক। যখন একটি সমন্বিত মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থা মানুষকে ভার্চুয়াল জগত থেকে আবার বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে পারে, তখনই নতুন এবং ইতিবাচক কিছু ঘটা সম্ভব। বই আর কম্পিউটার একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। ডিজিটাল মাধ্যম যেমন তথ্য এবং গতির যোগান দেয়, বই তেমনি আমাদের গভীর মনোনিবেশ এবং অস্তিত্ব রক্ষার অবকাশ দেয়।

১৯৯৪ সালে ইতালির সান মারিনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিম্পোজিয়ামে এ ভাষণটি দেন উমবের্তো একো। ভাষণটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন ***আমিরুল আবেদিন***

বি শে ষ র চ না

নকলনবিশের প্রকাশনাশিল্প

মুহিত হাসান

জাল বই বা 'পাইরেটেড' বই সম্পর্কে অবগত নন, এমন পাঠক-লেখক-প্রকাশক এ দেশে আছেন বলে মনে হয় না। জালি বইয়ের ক্রেতা হোন বা না-হোন, নকলনবিশ গোষ্ঠীর এই প্রকাশনাশিল্পের খবর নিশ্চিতভাবেই সবার কানে এসেছে। কিন্তু নকলনবিশ প্রকাশক কি মুদ্রাকরদের জালি বই ছাপবার এই 'গর্হিত' কারবার হাল আমলের কোনো কিছু? উঁহু, এর শুরুটা পনেরো শতকে গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের কয়েক যুগ পরেই। ইউরোপে আদি ছাপাখানার যুগে এক দেশের কোনো শহরে ছাপা হওয়া বই আরেক দেশের শহরে পুনর্মুদ্রিত হয়ে বাজারে দেদারসে কাটছিল—এমন কয়েকটি ঘটনাকে এক হিসেবে প্রথম যুগের জালি বই ছাপার তৎপরতা বলে বিবেচনা করা চলে। এমনকি এক জায়গার বই আরেক জায়গায় ছাপা হবার কারণে তখন কার্যত প্রকাশকের কপিরাইটের প্রশ্নটিও উঠতে শুরু করে। ফলে স্পেনের মিলানে ১৪৮১ সালে আদ্রেয়া দ্যে বসিস নামের এক প্রকাশক সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা জনৈক লেখক জেন সিমোনেটার *সফরজিয়াদে* নামের একটি বই ছাপার একচ্ছত্র অধিকার নিজের নামে নিবন্ধিত করিয়ে নেন। কিন্তু এতে তিনি সফল হতে পেরেছিলেন কি না জানা নেই, কারণ মিলানে ছাপা হওয়া বই ভেনিসে বা রোমে অন্য কেউ ছাপতে পারবে না এমন কোনো আইন তখন জারি হওয়া অসম্ভব ছিল।

ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডে জালি বই নিয়ে হয়ে যাওয়া এক অন্যরকম 'বিপ্লবের কাহিনি' এবার বলি। তখন যিনি ইংল্যান্ডের রানি, সেই মাননীয়া প্রথম এলিজাবেথ অভিজাত ও বড়লোক গোছের প্রকাশকদের সুবিধা দেওয়ার বেলায় বেশ অকৃপণ ছিলেন। ওই সময় রাজশাসনের নেকনজরে থাকা প্রকাশকরাই মূলত বাজারে চালু বই প্রকাশের একচ্ছত্র সুযোগ পাচ্ছিল। বাইবেল, বর্ণপরিচয়ের বই, মানচিত্র, ব্যাকরণ আর আইন বিষয়ক পুস্তক ছাপার বেলায় এই বৈষম্য জারি ছিল। ফলে অভিজাত প্রকাশকরা দেদারসে লাভ করলেও ক্ষুদ্র পুঁজির দরিদ্র প্রকাশকদের প্রায় না খেয়ে মরার দশা হয়েছিল। আবার অভিজাত প্রকাশকদের বের করা বইগুলোর দাম এত বেশি ছিল যে তা সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও কেনা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এমন অমানবিক বৈষম্য-দশা বিরাজ করলে যা হবার তাই অতপর হয়েছিল। ইংল্যান্ডের বইবাজারে গোপনে গোপনে, খানিকটা নীরবেই উত্থান ঘটলো জালি বইয়ের বাজারের। ক্ষুদ্র ও দরিদ্র প্রকাশকরা গোপনে অভিজাত প্রকাশকদের ছাপানো দামি অথচ প্রয়োজনীয় বইগুলোর প্রচুর পরিমাণে নকল কপি ছাপাচ্ছিলেন। আবার তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য খানিক বিপ্লবী কায়দায় বাজারে অধিক পরিমাণে বিপণনও করছিলেন। এর ফলে জালি কপিগুলোই বাজার দখল করে নিয়েছিল। সাধারণ স্বল্পবিত্তের পাঠকেরাও তাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আদতে ওই সময় ক্ষুদ্র প্রকাশকরা জালি বই দিয়ে যেন এক বিপ্লবই ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বলতে হয়। তারা বাজারে স্বাভাবিকভাবে বইয়ের ব্যবসা করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু অভিজাতদের 'মনোপলি'র কারণে তা পারছিলেন না। অগত্যা তারা নকল বইয়ের শরণ নিতে বাধ্য হন। এমন কাণ্ড দেখে প্রথম এলিজাবেথের প্রশাসন জালি বইয়ের প্রকাশকদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে। জালি বই ছাপতে পারে বলে সন্দেহ হলেই প্রকাশকের দপ্তরে তল্লাশি করা হতো। জালি বই পেলে তা বাজেয়াপ্ত তো করা হতোই, পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হতো মুদ্রণযন্ত্রও। কিন্তু এত করেও জালি বইয়ের ক্ষুদ্র প্রকাশকদের দমিয়ে রাখা যায়নি। জালি বইয়ের বিক্রি উল্টো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। ১৫৮১-৮২ সালে রজার ওয়ার্ড নামের এক প্রকাশক যেমন শিশুদের অক্ষর চেনার এক বইয়ের জালি এডিশন পয়লা দফাতেই ছেপেছিলেন মোটমাট দশ হাজার কপি, যেখানে তথাকথিত অভিজাত ও 'আসল' প্রকাশকেরা প্রথম মুদ্রণে দেড় হাজারের বেশি বই ছাপার কথা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না!

ষোড়শ শতকের অনেকটা সময় জুড়ে এই অভিজাত ও 'আসল' এবং 'জালি' বইয়ের ক্ষুদ্র প্রকাশকদের লড়াই চলেছিল ইংল্যান্ডে। শেষমেশ জয় হয় ক্ষুদ্র প্রকাশকদেরই। অভিজাতরা বইবাজারের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও ক্ষুদ্র প্রকাশকদের হাতে পরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ছোট প্রকাশকরাও বাজারচলতি প্রয়োজনীয় জনপ্রিয় বই ছাপার অধিকার পান।

পরে ইংল্যান্ডে শক্তপোক্ত প্রকাশনা আইন হলে জালি বই ছাপার প্রবণতা অনেকখানি কমে আসে। কিন্তু উনিশ শতকে এসে জালি বইয়ের উৎপাদনস্থল হিসেবে উঠে আসতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার আইনপ্রণেতারা তখন এই যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিল যে তাদের কপিরাইট আইন কেবলমাত্র এমন লেখকদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা আমেরিকার নাগরিক। এহেন ছলনাময় আইনি প্যাঁচের কারণে তাই ইংরেজ লেখকদের বইয়ের জালি কপিতে ছেয়ে যায় পুরো আমেরিকা, পরিণত হয় নকলনবিশ প্রকাশকদের তীর্থভূমিতে। এমন অবস্থায় ইংরেজ লেখক ও প্রকাশকদের তাই মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। স্বয়ং চার্লস ডিকেন্স একবার নিজের বই জালি হওয়া নিয়ে এক মার্কিন প্রকাশকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে শোনা যায়।

পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে, '১৮৯১ চেজ অ্যাক্ট' নামের একটি কপিরাইট আইন মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়। সেখানে বিদেশি প্রকাশকদের স্বত্বাধিকার ও প্রাপ্য অধিকারের প্রসঙ্গটিও আনা হয়েছিল, সম্ভবত বিগত দিনের সমালোচনার কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু ওই আইনেও যথেষ্ট ফাঁকফোকর ছিল, তাই ইয়াংকিল্যান্ডে জালি বই ছাপা হওয়াটা থামেনি। যা কি না চলে আরো প্রায় আশি বছর, ১৯৭৬ সালে মার্কিন কংগ্রেসে আরেকটি কপিরাইট আইন পাশ হওয়ার আগ অব্দি।

উনিশ শতকের বাংলায় যখন ছাপাখানার রমরমা, তখন জালি বইয়েরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। খোদ বটতলার বই, যেগুলোর দাম অত্যন্ত কম ছিল—সেসবও রেহাই পায়নি। কারণ, চাহিদা প্রচুর হলেও প্রকৃত প্রকাশক ছেপে বাজারে 'সাপ্লাই' দিয়ে কুলোতে পারতেন না। অগত্যা নকলনবিশ মুদ্রাকরদের তৎপরতা শুরু হয়। বাজেস্য বাজে কাগজে ছেপে বটতলার 'কী মজার শনিবার' বা 'চোরের ওপর বাটপারি' জাতীয় বইগুলোর জালি কপি উঠে যেত গ্রামগঞ্জ-মফস্বলগামী ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে। বিক্রি হতো ধুমসে। প্রকাশকরা তাই বইতে বিশেষ সিলমোহর বসিয়ে আসল-নকল বই চেনার বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হন। যেমন, ১৮৬২ সালে লোকনাথ নন্দীর লেখা ও কলকাতার সমাচার সুধাবর্ষণ মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হওয়া *ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল* বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় দেখতে পাই সিলমোহর ছাড়া নকল বই দেখতে পেলে তা পাঠকদের না কিনবার অনুরোধ ও তা লেখককে দ্রুত জানানোর আহ্বান : 'সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি এই পুস্তক আমার নামের মোহর ব্যতিত দেখিতে পাইবেন তিনি চোরাও বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিবেন না এবং যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকটে আনিতে পারেন তবে পুরস্কার পাইতে পারেন।' আবার তখনকার 'সিরিয়াস' পাঠ্যবইয়ের প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটিও নকলনবিশ চক্রের খপ্পরে পড়েছিল। তাদের বইয়ের একটা আলাদা কিসিমের চাহিদা ছিল। সঙ্গে ভালো ছাপা ও উন্নতমানের পাণ্ডুলিপির জন্য খ্যাতিও। তারা নিজেদের বইতে সাঁটিয়ে দেওয়ার জন্য যে বিশেষ সিলমোহর বানিয়েছিল—তারই নকশা হুবহু টুকে নিয়ে ভুয়া সিলমোহর তৈরি করে কেউ কেউ নিজেদের বইতে তা সেঁটে দিতে থাকে। ফলে বিভ্রান্ত হতে থাকেন পাঠক। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* প্রথম প্রকাশের পর থেকে যে কতবার জাল হয়েছে তার ইয়ত্তা পাওয়া মুশকিল। বিদ্যাসাগর তখন বই লিখে অনেক অর্থ আয় করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু জালি বইয়ের মুদ্রাকররা তাঁকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীনও করিয়েছিল। বই জাল হওয়া নিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ ১২৯০ সংখ্যায় (১৮৮৪ ইংরেজি সাল) তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের তাঁর জালি বই কেনা থেকে সতর্ক করেছিলেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশকদের বিভাজন...

আবার নির্বাচন আয়োজনের পর নতুন সরকারের স্টেবল হতেও কিছুদিন সময় লাগে। সব বাস্তবতা বিবেচনায় মেলা ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজন করাই শ্রেয়। কিন্তু অনেকে ফেব্রুয়ারিতেই আয়োজনের পক্ষে রায় দিলেন। আবার তারাই রমজানে মেলা আয়োজনের বিরোধিতা করলেন। অনেকে আবার ঈদের পরে মেলা আয়োজনের যুক্তি দেন। সেটার তো বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ ওই সময় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকবে। এই দোদুল্যমান অবস্থার কারণে অনেক কাজই শেষ করতে পারিনি। এমন একটা জাতীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রকাশকদের বিভাজন মেনে নেওয়ার নয়।

সেই ২০১৭ সাল থেকেই তো প্রকাশনায় কাজ করছেন। এত দিনে কী মনে হলো, প্রকাশনার সমস্যা আর মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : এখানে আসলে দক্ষ সম্পাদক নেই। তাছাড়া সেন্ট্রাল মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে *গ্রন্থিক*-এর বইগুলো তো ভালোই বিক্রি হচ্ছে। অন্য বুকশপগুলোতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশিত বইয়ের বিক্রি কিংবা পাঠকের ফিডব্যাক পাওয়া যায় না। আবার বিক্রির টাকা ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। বুকশপগুলো ঠিকঠাক টাকা দিতে পারে না বা দেয় না।

এদিকে 'বাপুস' নামে আমাদের একটা সংগঠন আছে। সেটিও পর্যাপ্ত মনিটরিং করছে না। এখন আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারছি না। যেসব বই প্রকাশ করছি, সেগুলোর প্রতি অন্তত হাজারখানেক মানুষ আগ্রহী নন এমনটা হতে পারে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি এ প্রচারণাটা ভালোভাবে করা যায়, তাহলে অনেক অডিয়েন্সের কাছে যাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জেনজিদের আকর্ষণ করা যেতে পারে। শুধু জেনজিই নয়, এখন তো প্রায় সব বয়সের মানুষই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। এ বিষয়গুলোর সম্ভাবনাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে চেষ্টাই আমরা করছি।

আপনি প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হলেন কীভাবে?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : ছাত্রাবস্থায় আমি একটি বাম ঘরানার ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন সংগঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই প্রকাশনার কিছু কাজ করতাম। তাছাড়া বই পড়ার প্রতিও একধরনের ভালোবাসা ছিল। তা থেকেই একসময় মনে হলো, এ ব্যবসাটাই করি।

গ্রন্থিক বরাবরই একটু সিরিয়াস ঘরানার বই করে থাকে। রাজনীতি, দর্শন, অধ্যাত্মবাদকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ধরনের বই প্রকাশের ইচ্ছে এলো কীভাবে?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : আমার প্রকাশনা ব্যবসাতে আসার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা। সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে প্রকাশনার সঙ্গে পড়াশোনার সমন্বয়ও ঘটাতে হয়। তখন খেয়াল করেছি, এ দেশে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক বই নেই। সে জায়গা থেকেই আমাদের প্রকাশের কাজ শুরু। রাজনৈতিক তত্ত্বকে বরাবরই গুরুত্ব দিই বেশি।

পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : কন্টেন্টটাকেই আসলে মাথায় রাখা হয়। কন্টেন্টটা ভালো হলে আমরা ছাপাই। আমাদের আগ্রহের একটা বড় জায়গা হলো রাজনৈতিক বই। এরপর আমরা গুরুত্ব দিই সুফিবাদ কিংবা সুফিজমের বইকে। তাই যখনই কোনো কন্টেন্ট বা পাণ্ডুলিপি আসে, আমরা এভাবেই নির্বাচন করি। ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে তার কন্টেন্টটাকেই প্রাধান্য দিই। যদি মনে হয় কন্টেন্টটা মানসম্পন্ন, তাহলে পাণ্ডুলিপি বাছাই করা হয়।

প্রকাশনাশিল্পে পথচলার এ দীর্ঘ সময়ে আপনার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি কেমন?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : আসলে প্রাপ্তিই বেশি। পাঠকের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাই। প্রচুর শ্রম বিনিয়োগ করি। এখন অনেকেই আব্দুর রাজ্জাক রুবেলকে চেনেন না। কিন্তু গ্রন্থিকের কথা বললে তারা ঠিকই চেনেন। এটা অনেক অপ্রাপ্তি মুছে দেয়।

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাতিষ্ঠানিক নীতির জায়গা...

ছিল। আমি মেলা আয়োজক কমিটির একজন সদস্য। যখন মেলার তারিখ নির্ধারণের জন্য মিটিং হলো, তখন আমি এই সময়ে মেলা করার বিষয়ে মৌখিকভাবে অসম্মতি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কমিটির বাকি সদস্যরা ফেব্রুয়ারিতেই মেলার পক্ষে ছিলেন। তাই মেলার পূর্বনির্ধারিত তারিখই চূড়ান্ত হলো।

কিন্তু পরবর্তীতে আমি লক্ষ করলাম, মেলার এই তারিখ নিয়ে সাধারণ প্রকাশকদের মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ রয়েছে এবং অনেকেই আমার মতো একই আপত্তি জানাচ্ছেন। এরপর আমি ইউপিএল-এর মাহরুখ আপা, *অন্যপ্রকাশ*-এর মাজহার ভাই, *অনন্যা*র মনির ভাই, *কাকলী*র সেলিম ভাই, *অ্যাডর্ন*-এর জাকির ভাইয়ের সাথে আলাপ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমাদের মূল দাবি ছিল, ঈদের পর সুবিধাজনক সময়ে মেলার আয়োজন করা।

একটি রাজনৈতিক চাপ ছিল যে, মেলা ফেব্রুয়ারিতেই করতে হবে। এরপর যখন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলো, তখন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিজে বাংলা একাডেমিতে এসে আমাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনায় বসলেন এবং মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালেন। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, প্রকাশনাশিল্পের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলো তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যৌক্তিক সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। মূলত সরকারের এই ইতিবাচক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক ক্ষতি মেনে নিয়েও মেলায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

এবারের মেলায় অংশগ্রহণের বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন হচ্ছে?

মাহাবুব রাহমান : বাস্তব অভিজ্ঞতা করুণ। কর্মদিবসগুলোতেও মেলায় পাঠকের চরম খরা যাচ্ছে। এটা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে, এবারের বইমেলায় যতগুলো স্টল আছে, কর্মদিবসে ততজন পাঠকও মেলায় আসেন না। শুক্র আর শনিবারের চিত্র কিছুটা ভিন্ন।

দীর্ঘদিন ধরে আপনি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত। এই দীর্ঘ যাত্রার শুরুটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

মাহাবুব রাহমান : প্রকাশনা জগতে আমার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০১০ সালে। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে সাংবাদিকতার অনিশ্চিত চাকরির পাশাপাশি *আদর্শ* প্রতিষ্ঠা করি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত চাকরির পাশাপাশি প্রকাশনাতে সময় দিয়েছি। ২০১৫ সালে চাকরি-বাকরি ছেড়ে প্রকাশনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই।

এই যে পনেরো বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এর আলোকে আমাদের প্রকাশনাশিল্পের মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী কী বলে আপনি মনে করেন?

মাহাবুব রাহমান : আমাদের প্রকাশনাশিল্পের সবচেয়ে বড় এবং মূল চ্যালেঞ্জ হলো পাঠক-ক্রেতা। এ সংখ্যাটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—প্রকাশিত বইয়ের অন্তত শতকরা আশি ভাগ বইয়ের ক্ষেত্রে তিনশো কপি বিক্রি হওয়ারও নিশ্চয়তা থাকে না। তদুপরি, করোনা মহামারির পর থেকেই প্রকাশনার পুরো প্রক্রিয়াটি এখন চরম ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। একটি বই ছাপার ক্ষেত্রে কাগজ থেকে শুরু করে প্লেট তৈরি, ছাপা এবং বাঁধাই—প্রতিটি স্তরেই আনুষাঙ্গিক কাঁচামাল ও সেবামূল্যের ঊর্ধ্বগতি এখন আকাশচুম্বী। আগে যেখানে ১০ ফর্মার একটি বই ২৫০ কপি বিক্রি করলে বিনিয়োগের কাছাকাছি সাধারণ লাভ করা যেত, সেখানে বর্তমানে ২৫০ কপি বিক্রি হলে কেবল বিনিয়োগটাই উঠে আসে।

বিগত সরকারের সময় আপনাদের প্রকাশনীকে একবার স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। সেটার কারণ কী ছিল? সেই সময়ে বিষয় নির্বাচন করে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ ছিল, বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখছেন কি?

মাহাবুব রাহমান : হ্যাঁ, অতীতে যা ঘটেছে, তা তো আমাদের স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটি নগ্ন বাধা-ই ছিল। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বড় পরিসরে মতপ্রকাশে সরাসরি বাধা দেওয়া হচ্ছে—এমন কোনো নজির অন্তত এখনও আমি দেখিনি। আর যদি ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটে, তবে তা সত্যিই চরম হতাশাজনক হবে। বিগত সরকারের আমলে কিছু সুনির্দিষ্ট বই প্রকাশের কারণে প্রকাশকদের চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল। সেই অন্ধকার অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি যেন আর কখনো না ঘটে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সেটাই আমাদের প্রধান প্রত্যাশা।

শেষ পৃষ্ঠার পর

বইমেলা যেহেতু আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়, তাই বইমেলাটা ফেব্রুয়ারি মাসে হওয়ার একটা তাৎপর্য আছে। কিন্তু প্রকাশকদের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে—তা বেদনাদায়ক। সবার মত এক হতে হবে এমনও নয়। যে যার মত প্রকাশ করতে পারে, এখানে বিভেদের কিছু নেই।

যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো চেয়েছিল মেলাটা ঈদের পরে করতে, তাদেরও যুক্তি আছে। মুসলিম-প্রধান দেশ হিসেবে রমজান মাসে মানুষ সেহেরি ও ইফতার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। স্বাভাবিকভাবে যেটা হয়—বইমেলায় পাঠকদের যে আনাগোনা, যেই ভিড় প্রত্যাশিত, সেটা আশানুরূপ হয় না। যে কারণে স্বাভাবিকভাবে এই বছর ভিড় অনেকটা কমেছে। আমাদের পাঠকের যে অভাব, সে আশঙ্কা থেকেই কিন্তু মতবিভেদ তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি প্রকাশকরা সবাই একই সুতোয় গাঁথা। এখানে প্রকাশকদের মধ্যে কোনো বিভেদ তৈরি হয়নি। সবারই যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু বইমেলা ও বাংলা একাডেমিকে সহযোগিতা করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতেও আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেহেতু আমরা একটি সমিতিকে রিপ্রেজেন্ট করি, একটি শিল্পকে রিপ্রেজেন্ট করি। আমি মনে করি নতুন সরকার আসার পর স্বল্প সময়ে বইমেলাটা আয়োজন করার যে সাহসিক সিদ্ধান্ত বাংলা একাডেমি নিয়েছে, যেভাবে বাপুসের সহযোগিতা পেয়েছে, যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছিল, তাদের জন্য যে স্টল ভাড়া মওকুফ করে সবাইকে একই সুতোয় নিয়ে আসতে পেরেছে, এটা ভালো দৃষ্টান্ত। হয়তোবা ব্যবসায়িক সফলতা এই বইমেলায় আমরা পাইনি। এটা খুব চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আমরাও শঙ্কায় ছিলাম, বইমেলা হবে কি হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার যে ঐতিহ্য, সেটা আমাদের অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। আগামী কয়েক বছর বইমেলাটা রমজান মাসেই পড়বে। তাহলে আগামীতে আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব? পুরোটাই নির্ভর করছে সবার সদিচ্ছা ও বাস্তব জ্ঞানের ওপর।

অনেকেই অভিযোগ করছেন, এবারের মেলা পাঠক-ক্রেতাশূন্য। আপনাদের বিক্রিবাট্টা কেমন?

মাহমুদুল হাসান : ভিড় কম, কিন্তু পাঠক বা ক্রেতার উপস্থিতি আছে। আসলে আমরা বিক্রি করেছি যা, তা আমাদের আশার চেয়ে আমি কম বলব না, বরঞ্চ বেশি।

এখানে সৃজনশীল প্রকাশনা ব্যবসা হিসেবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও কিন্তু অনেক তরুণ এ ব্যবসায় আসতে চায়। অনেকে হয়তো সাহসটা পায় না। কিংবা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে সেটাও আসলে বুঝে উঠতে পারে না। তাদের প্রতি আপনার কোনো পরামর্শ আছে?

মাহমুদুল হাসান : প্রকাশনাটাকে আগে ভালোবাসতে হবে। প্রকাশনাটাকে ধারণ করতে হবে। কারণ প্রকাশনাটা, আমি মনে করি অন্যান্য ব্যবসার মতো নয়। দেখবেন আমাদের যেসব প্রকাশক সৃজনশীল বা বড় বড় প্রকাশক আছেন তারা কম-বেশি লেখেন, কম-বেশি পড়েন। তাদের এই বই পড়া বা এই যে প্যাশন বা প্রকাশনার যে প্যাশন সেটা থাকতে হবে। এটা এক অর্থে শিল্প, আরেক অর্থে ইন্ডাস্ট্রি। এই আর্টটা যদি ধারণ না করে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি, তরুণদের জন্য, কাছে একটি পণ্য। সেভাবেই এটিকে উপযোগী করতে হয়। তরুণ লেখকদের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পাদনার মাধ্যমে যত্ন নেওয়ার প্রবণতা থাকে।

বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

ফারুক হোসেন : আমাদের এখানে অনেক প্রকাশনী নিজ সক্ষমতা ও সৃজনশীল পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ কাজটার মধ্যে একধরনের ঐক্য এবং প্রকাশনীগুলোর মধ্যকার সমন্বয়ের কিছুটা অভাব আছে। আমরা যদি কলকাতার প্রকাশনীগুলোর দিকেই তাকাই তাহলে কিন্তু অনেক কিছু বোঝা যায়। তাদের ওখানে প্রকাশকদের সংগঠন থেকে শুরু করে পরিকল্পনা পর্যায়েও সাংগঠনিক অবস্থান বেশ শক্ত। আমাদের এখানে প্রকাশক ঐক্য বা সাংগঠনিক ঐক্য নেই। অধিকাংশ প্রকাশনী এখন নিজেদের আয়োজনে মেলা করে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে বিভাগীয় বা কোনো ইভেন্টকেন্দ্রিক মেলা ওই অর্থে হয় না। অর্থাৎ প্রকাশক সমিতির উদ্যোগে যে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ মেলা হবে তা কিন্তু হচ্ছে না। শুধু একুশে বইমেলাটাই এখানে হয় বড় পরিসরে। অন্তত এখনও এমন সংস্কৃতি গড়েনি।

জেনজি বা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কিন্তু পড়ার আগ্রহ বাড়ছে। এটাকে প্রকাশনার সম্ভাবনা হিসেবে কীভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন?

ফারুক হোসেন : অনেকে বলেন যে আসলে বইয়ের বিক্রি আগের চেয়ে কমে গেছে। মানুষ এখন আর পড়ে না। এ ধারণাটি ভুল। মানুষ আসলে পড়ে। কারণ, এখন অনেক জনপ্রিয় বই আছে। এখন খুঁজলে দেখা যাবে, ফেসবুক বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের গল্প অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়। মানুষ সেগুলো খুঁজে খুঁজে পড়ছেন। পাঠকপ্রিয় এ গল্পগুলোকে মানুষ শুধু অ্যাপ বা অন্য প্লাটফর্মে পড়তে চান না। তাই তারা বই কিনে নেন। এটা কি ভালো দিক নয়? সার্বিকভাবে বই কেউ পড়ে না এ ধারণা ভুল। প্রতিটা প্রকাশনীর নিজস্বতা আছে। সে অনুযায়ী তারা বই প্রকাশ করেন। আর এ নিজস্বতার আদলেই তাদের পাঠক আসে। আমরা বরাবরই আমাদের নিজস্ব অবস্থানটা ধরে রাখার চেষ্টা করি। *অন্যধারা* বরাবরই তাতে গুরুত্ব দেয়।

প্রকাশকরা সবাই একই...

এটা যদি কেবল ব্যবসা হিসেবে নিতে চায়, তো খুবই কঠিন। প্রকাশনাটাকে উন্নত দেশগুলোতে অনেক সফিস্টিকেটেড আর প্রেস্টিজিয়াস একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গণ্য করা হয়। সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গা প্রকাশনা, যেটা বাংলাদেশে হয়নি। অবশ্যই আমরা চাই তরুণরা প্রকাশনায় আসুক। কারণ বাংলাদেশে এখন অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী আছে, যারা প্রকাশনাটাকে বুঝতে চায়। কারণ তারা অনেক বই পড়ে, বই নিয়েই জীবনযাপন করে। আমি মনে করি প্রকাশনায় বইগুলো প্রকাশ করার যে টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আছে, সেটাও কিন্তু একটা শেখার ব্যাপার, উপভোগের ব্যাপার এবং সর্বোপরি একটা শৈল্পিক ব্যবসাক্ষেত্রের ব্যাপার।

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশক আর সংশ্লিষ্ট...

কেন ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলা করা হবে না, রমজানের আগে কেন মেলা আয়োজন করা যায় এসব বিষয়ে আলোচনা বারবার হয়েছে। এখন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দিকে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু জটিলতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই নির্দেশনা দিলো, ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে মেলা করা যাবে না। পরে, ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে অবশ্য একটা সার্কুলার হলো। অনেক প্রকাশনী নানা হিসাব-নিকাশ করায় মেলায় অংশ নিতে চায়নি। আমরা অবশ্য সার্কুলার অনুযায়ী মেলায় অংশগ্রহণের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করি। এখন আমার কথা হলো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পর যে বাড়তি সময়টা আমরা পেলাম, ওই সময় সব প্রকাশক আর সংশ্লিষ্ট পক্ষের একত্রিত হওয়া জরুরি ছিল। সেটা করতে পারলে এত জটিলতা বাড়ত না। বরং তাতে সবার মঙ্গলই হতো। কারণ, সেই ডিসেম্বর থেকেই তো মেলার আয়োজন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। মানে মেলার মূল আয়োজনের আগে অন্তত দেড় মাসের মতো একটা আলোচনার সময় ছিল। আলোচনাটা হলে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারিতেই আমরা মেলার আয়োজন করতে পারতাম। তাতে অন্তত ঈদের আগে মেলার জন্য কিছুটা বেশি সময় পেতাম। আলোচনা না হওয়ায় আসলে মেলা এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল।

বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনাদের ভাবনা কী থাকে? বিশেষত তরুণদের ক্ষেত্রে ভাবনা কী?

ফারুক হোসেন : আমাদের এখানে লেখকদের মধ্যে কিছু প্রত্যাশা থাকে। অনেক লেখক চান তার লেখাটি প্রকাশিত হোক। কিন্তু দিনশেষে আমার এটা একটা ব্যবসা। এখানে ছাপানোর জন্য আমাকে বিনিয়োগ করতে হয়। এ বিনিয়োগ যথাযথভাবে উঠে আসছে কি না, তা অবশ্যই ভাবতে হয়। আবার শুধু জনপ্রিয়তার নিরিখে বই ছাপালে হবে না। আমরা চেষ্টা করি বইয়ের কন্টেন্ট এবং লেখার মান যেন পাঠোপযোগী হয়। প্রকাশক হিসেবে বই আমার

সাড়ে ৩ দিনের প·ত্রি·কা

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৬ । শুক্রবার । ১৩ মার্চ ২০২৬ । ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২

আমরা বিশ্বাস করতাম, এ দেশে কম দামে বুদ্ধিদীপ্ত বই পড়ার জন্য বিশাল এক পাঠকসমাজ আছে—আর সেই বিশ্বাসের ওপরই আমরা সবকিছু বাজি ধরেছিলাম

—অ্যালেন লেইন
প্রতিষ্ঠাতা, পেঙ্গুইন বুক্‌স

সম্পাদকের কলাম

আজহার ফরহাদ

লেখক প্রকাশনার প্রাণ, পাঠক তার আয়ু

চলছে রমজান মাস, অনেক আশঙ্কা ও দ্বিধা পেরিয়ে রোজার মাসে বইমেলা আসলে যেমন হওয়ার কথা ঠিক তেমনই হচ্ছে। এ বইমেলা নিয়ে যেটুকু ধারণা করেছিলাম, মেলা বরং তার চেয়ে ভালো হচ্ছে। একেকজন মানুষ, একেকজন প্রকাশক একেকভাবে কথা বলছেন। তাদের নানান চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে। মূল বিষয় হলো, বই নিয়ে যদি প্রকাশকের প্রস্তুতি থাকে, যদি উপলক্ষ্য হয় বই এবং তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়বদ্ধতা থাকে, তবে রমজান মাস কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

অনেকেই বলছেন যে বইমেলা জনশূন্য। জনবাহুল্য এক বিষয় আর পাঠক হচ্ছে আরেক। একুশে বইমেলায়

এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

একুশে বইমেলা ২০২৬

প্রকাশকের মুখোমুখি

প্রাতিষ্ঠানিক নীতির জায়গা থেকেই এক হয়েছি

—মাহাবুব রাহমান, *আদর্শ*

বইমেলা নিয়ে শুরু থেকেই নানা জল্পনা-কল্পনা এবং প্রকাশকদের মধ্যে বিভাজন লক্ষ করা গেছে। এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

মাহাবুব রাহমান : এবারের বইমেলার আয়োজনকে ঘিরে শুরু থেকেই *আদর্শ* প্রকাশনীর একটি ভিন্ন ও স্পষ্ট অবস্থান

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

প্রকাশকরা সবাই একই সুতোয় গাঁথা

—মাহমুদুল হাসান, *বেঙ্গলবুকস*

অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ আয়োজন নিয়ে একটা সংকট তৈরি হয়েছিল। বাপুস-এর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার অভিমত কী?

মাহমুদুল হাসান : প্রথমত, আমি এটাই বলতে চাই, বাংলা একাডেমি ও বাপুস একই পথে হেঁটেছে। আমরা চেয়েছিলাম বইমেলাটা হোক।

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

প্রকাশক আর সংশ্লিষ্ট পক্ষের একত্রিত হওয়া জরুরি ছিল

—ফারুক হোসেন, *অন্যধারা*

এবারের বইমেলা নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা ছিল। এ নিয়ে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন কী?

ফারুক হোসেন : শুরুতে বাংলা একাডেমি, বাপুস ও অন্যান্য প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ সময় প্রচুর আলোচনা হয়।

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

প্রকাশকদের বিভাজন মেনে নেওয়ার নয়

—আব্দুর রাজ্জাক রুবেল, *গ্রন্থিক*

অনেকেই রমজানের সময় বইমেলা আয়োজনের পক্ষে ছিলেন না। মেলা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

আব্দুর রাজ্জাক রুবেল : আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম রমজানে মেলার আয়োজন হলে লসের সম্ভাবনাই বেশি। তাই গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই এ বিষয়ে সরব ছিলাম। বলেছিলাম, মেলাটা ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে করলে ভালো হয়।

এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বুক ইনফ্লুয়েন্সার কলাম

প্রকাশনাশিল্পে প্রোডাকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ

অথৈ দাস তিন্নি

ডোন্ট জাজ আ বুক বাই ইটস কভার—এ বাক্যটিকে আমরা পাঠকেরা এখন আর পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। বই কেনার সময় প্রচ্ছদ কেন, বাইন্ডিং আর কাগজও দেখে নিতে চাই। তারপর আসে ছাপার অক্ষর, ফন্ট সাইজ আর কত স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছে—এসব মানসিক হিসাব-নিকাশ। প্রকাশনাশিল্পে বইয়ের প্রোডাকশন তাই পরোক্ষভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি হাল আমলে কিছু প্রকাশনীও বুঝতে পারছে। সে অনুযায়ী বইকে পাঠকের কাছে উপস্থাপনের নানা প্রক্রিয়া তারা এখন অনুসরণ

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান | **সম্পাদক :** আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা পর্ষদ : তৌহিদ ইমাম, আমিরুল আবেদিন আকাশ, রাশেদ সাদী, আরিফুল হাসান
প্রতিকৃতি অঙ্কন : রাজীব রাজু | **গ্রাফিক ডিজাইন :** সাইফুল সাগর, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদ মিজু

বেঙ্গলবুকস-কিন্ডারবুকস নিবেদিত একটি বইমেলা প্রকাশনা। প্রকাশক কর্তৃক নোভা টাওয়ার ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

ফোন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩ ● ইমেইল : info@kinderbooks.com.bd, info@bengalbooks.com.bd ● ওয়েব : www.kinderbooks.com.bd, www.bengalbooks.com.bd